ATMADEEP
An International Peer- Reviewed Bi- monthly Bengali Research Journal
ISSN: 2454–1508
Impact factor: 4.5
Volume- I, Issue-VI, July, 2025, Page No. 1405-1417
Published by Scholar Publications, Sribhumi, Assam, India, 788711

রবীন্দ্র কবিতায় স্বদেশপ্রেম: বঙ্গভঙ্গ আন্দোলনের পূর্বে ও পরে

সরস্বতী বারুই, *গবেষক, বাংলা বিভাগ, বিনোদ বিহারী মাহাতো কয়লাঞ্চল বিশ্ববিদ্যালয়, ধানবাদ, ঝাড়খণ্ড, ভারত*

Received: 19.07.2025; Accepted: 22.07.2025; Available online: 31.07.2025
©2025 The Author(s). Published by Scholar Publications. This is an open access article under the CC BY license (https://creativecommons.org/licenses/by/4.0/)

Abstract

Rabindranath Tagore is famous as a poet. The number of his poems is immense. Among that number, the number of patriotic poems is very small. But in that small space, hi has expressed deep love for his homeland. Under the British rule, the people of India were singing about their own culture. Rabindranath has repeatedly reminded the people of India in his poems. Hi started his patriotic poems with the poem ‘Hindu Melar Upahar’. At that time, he was just a boy. This poem reveals his deep childhood feelings for his country. Hi got such a deep sense of patriotism from his family. Then, due to the impact of time and circumstances, his patriotism transformed. The proposal to partition Bengal by the British government in 1903 brought about a social and political change in the national life of India. At that time, the term Bangladesh meant both present-day Bangladesh and west Bengal. The first proposal to divide this undivided Bengal was made by Lord Curzon. This proposal was declared effective on 16th October 1905. The people of the who le of Bengal rose up in protest against this proposal. This movement stirred the people of Bengal with a sense of patriotism. At this time, Rabindranath played the role of a leader in the life of the people of Bengal.

This movement brought about a change in his patriotic poetry. Before the movement, his patriotic poetry was more about the glory of ancient India. After the movement, it transformed into spiritual love. This change in Robindra’s patriotic poetry has been clarified in this article.

Keyword: Swodeshprem, Bangabhanga, Bangabasi, Andolon, Rabindranath, Deshatmabodhok, Uttejonam, Boykot, Sanskriti Kabita

“আমি বিপুল কিরণে ভুবন করি যে আলো—
তবু শিশিরটুকুরে ধরা দিতে পারি
বাসিতে পারি যে ভালো।”[১]

রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর ‘উৎসর্গ’ কবিতায় কথাগুলি সূর্যের বক্তব্য হিসাবে ব্যবহার করেছেন। কথাগুলি সূর্যের সম্বন্ধে যেমন সত্য স্বয়ং রবীন্দ্রনাথ ঠাকুরের সম্বন্ধেও তেমনি সত্য। বিশ্বব্রহ্মাণ্ডের ভালোমন্দের সাধনায় তিনি যেমন মগ্ন ছিলেন তেমনি নিজের মাতৃভূমির উন্নতি সাধনে গ্রামবাংলার অতিক্ষুদ্র বিষয়ও তাঁর দৃষ্টি এড়ায়নি। এখানেই তাঁর স্বদেশপ্রেমের গভীরতা। এই সুগভীর স্বদেশপ্রেম তাঁর কবিতায় ছড়িয়ে ছিটিয়ে আছে। তাঁর কবিতা লেখার হাতেখড়ি স্বদেশপ্রেমমূলক কবিতা দিয়ে। তারপর সময় এবং অভিজ্ঞতার সাথে সাথে স্বদেশপ্রেমের অনুভূতি বিভিন্ন রূপে প্রকাশ পেয়েছে। এটাই স্বাভাবিক। সামাজিক এবং রাজনৈতিক ঘাত-প্রতিঘাত একজন প্রকৃত সাহিত্যকের চেতনার পরিবর্তন ঘটাবে— এমনটাই স্বাভাবিক। রবীন্দ্রনাথের জীবনেও এর ব্যতিক্রম ঘটেনি।

ভারতবর্ষের জাতীয় জীবনে সামাজিক ও রাজনৈতিক পটপরিবর্তন আনে ১৯০৩ খ্রিস্টাব্দে ইংরেজ সরকারের বঙ্গভঙ্গ প্রস্তাব। তখন বাংলাদেশ বলতে, আজকের বাংলাদেশ এবং পশ্চিমবঙ্গ উভয়কেই বোঝাতো। সেই অবিভক্ত বাংলাকে দ্বিখণ্ডিত করার প্রথম প্রস্তাব দিয়েছিলেন লর্ড কার্জন। ১৯০৫ খ্রিস্টাব্দের ১৬ই অক্টোবর এই প্রস্তাব কার্যকারি হিসাবে ঘোষিত হয়েছিল। গোটা বাংলার মানুষ এই প্রস্তাবের বিরোধীতা করে আন্দোলনে মেতে উঠেছিল। এই আন্দোলন বঙ্গবাসীকে স্বদেশপ্রেমের উত্তেজনায় মাতিয়ে তুলেছিল। এই সময় রবীন্দ্রনাথ বঙ্গবাসীর জীবনে কাণ্ডারীর ভূমিকা পালন করেছিলেন। বিভিন্ন সভা সমিতিতে প্রবন্ধ পাঠ এবং স্বদেশী গান রচনার দ্বারা বঙ্গবাসীকে মাতিয়ে তুলেছিলেন। বিশেষ করে তাঁর রাখি-বন্ধন উৎসব পালন বঙ্গবাসীর জীবনে মেলবন্ধনের সেতু নির্মান করেছিল। তবে রবীন্দ্রনাথ বঙ্গভঙ্গ প্রস্তাবের বহু আগে থেকে একাধিক কবিতা রচনা করে বঙ্গবাসীর এই স্বদেশপ্রেমকে জাগ্রত করার চেষ্টা করেছিলেন। কিন্তু তখন তিনি সেভাবে কোনো সাড়া পাননি। ইংরেজ সরকারের বঙ্গভঙ্গ প্রস্তাব যেন তাঁর সেই বহুদিনের অপেক্ষা পূরণ করেছে। হয়তো সে কারণেই তিনি বিভিন্ন প্রবন্ধে বঙ্গভঙ্গ প্রস্তাবকে শুভদিক থেকে বিচার করার প্রেরণা দিয়েছেন। তাঁর মতে, বঙ্গভঙ্গের আঘাতে বঙ্গবাসীর মধ্যে স্বদেশপ্রেম জাগ্রত হওয়াই একটি শুভ লক্ষণ। একে দেশ গড়ার কাজে লাগাতে চেয়েছিলেন তিনি। যদিও শেষ পর্যন্ত তাঁর এই প্রচেষ্টা শুধুমাত্র কবি কল্পনা বলে ব্যর্থতায় পরিণত হয়। কিন্তু তিনি থেমে থাকেননি। বিভিন্ন প্রবন্ধ, চিঠিপত্র, কবিতা, গান, উপন্যাস, ছোটগল্প রচনার দ্বারা এবং পল্লী-সংস্ককরণের কাজে নিমজ্জিত হয়ে দেশকে অভ্যন্তরীণ দিক থেকে শক্তিশালী ভাবে তদেবক্যবদ্ধ করার চেষ্টা চালিয়েছিলেন। যাতে দেশ কখনোই কোনো বাইরের শক্তির আঘাতে টুকরো টুকরো না হয়। সে-সকল বিস্তারিত আলোচনা এত ছোট পরিসরে সম্ভব নয়। আমাদের আলোচনা বঙ্গভঙ্গ আন্দোলনের পূর্বে ও পরে রবীন্দ্র কবিতায় স্বদেশপ্রেমের পরিবর্তনের মধ্যে সীমাবদ্ধ থাকবে। বঙ্গভঙ্গ আন্দোলনের পূর্বে রবীন্দ্রনাথের স্বদেশপ্রেমমূলক কবিতায় প্রাচীন ভারতের গৌরব কথাই বেশি। তারপর তাঁর স্বদেশপ্রেমমূলক কবিতায় গ্রামবাংলার দুখী মানুষদের কথা প্রকাশ পেয়েছে। বঙ্গভঙ্গ আন্দোলনের পরবর্তীকালে তাঁর স্বদেশপ্রেম আধ্যাত্মপ্রেমে রূপান্তরিত হয়েছে। এই প্রবন্ধে রবীন্দ্র-কবিতায় স্বদেশপ্রেমের এই পরিবর্তনকেই স্পষ্ট করা হয়েছে।

১৯০৩ খ্রিস্টাব্দে বঙ্গভঙ্গ আন্দোলনের সূচনালগ্নে শিক্ষিত বাঙালি দেশাত্মবোধীরা অনেক ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র বিষয়কে উপেক্ষা করেছেন বা তাঁদের দৃষ্টি-গোচরই হয়নি। যেমন— পল্লীপ্রকৃতির অবহেলিত মানুষদের আন্দোলনে সামিল করা, তাদের চেতনায় স্বদেশপ্রেম জাগ্রত করার পরিকল্পনা, আন্দোলনে বাংলার লোকসঙ্গীতের প্রয়োগ ইত্যাদি। কিন্তু রবীন্দ্রনাথ ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র দেশীয় সংস্কৃতিকে বঙ্গভঙ্গ আন্দোলনের সঙ্গে জুড়ে দিয়ে আন্দোলনটিকে পূর্ণতা দান করেছেন। তিনি কীভাবে বিন্দুতে সিন্ধু দর্শন করেছেন তারই একটি প্রকাশ দেখা যায় 'শোকচিহ্ন' প্রবন্ধে। তিনি বলেছেন—

> "ইংরেজ আত্মীয়ের শোকে কালো চিহ্ন ধারণ করে, বাঙালির মাঝখানে বাস করিলেও কাছা পরে না বা হবিষ্যান্ন খায় না।...আমাদের মধ্যে এই একটা অদ্ভুত ব্যাপার দেখা যাইতেছে যে, যেখানে আমরা বলের দ্বারা পরাধীন সেখানে তো কথাই নাই; কিন্তু যেখানে আমরা বাধ্য নই, যেখানে আমরা স্বাধীন — সেখানেও আমরা ইচ্ছাপূর্বক পরবশতার একটা চিহ্ন গ্রহণ করতে পারিলে যেন খুশি হই।... লোকের মধ্যেও এই রূপ সাহেবিয়ানা খাটাইতে যাওয়া যে কতখানি মজ্জাগত দাসত্বের পরিচায়ক তাহা সহৃদয় লোকের কাছে প্রমাণ করিতে বসাই বাহুল্য।
> বঙ্গবিভাগ লইয়া আমাদের দেশের কোনো কোনো খবরের কাগজ অঙ্গপ্রান্তে মসীলেপনের দ্বারা শোক চিহ্ন প্রকাশ করিতেছেন।...বেদনাটা বাঙালির পক্ষে এতটাই আন্তরিক, এতই সত্য যে, এ স্থলে একটা বিদেশী চিহ্নধারণের আরম্বর নিতান্তই অসঙ্গত এবং সেই জন্যই এরূপ দৃশ্যে আমরা লজ্জা অনুভব না করিয়া থাকিতে পারি না।"[২]

বঙ্গ-বিচ্ছেদের দুঃখকে কালো চিহ্ন ব্যবহারের দ্বারা প্রকাশ যে কতটা অন্যায়জনক তা রবীন্দ্রনাথ চোখে আঙুল দিয়ে ধরিয়ে না দিলে হয়তো শিক্ষিত আন্দোলনকারীদের নজরেই আসত না। একদিকে বিদেশি জিনিস ব্যবহারের বয়কট করা, অথচ অন্যদিকে দেশীয় সংস্কৃতিকে ভুলে বিদেশি সংস্কৃতির শোকচিহ্ন ব্যবহার আন্দোলনকারীদের দৃষ্টি এড়িয়েছে। কিন্তু রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর? বড়ো বিষয় তো বটেই এমন ছোটোখাটো বিষয়েও তিনি ছিলেন যথেষ্ট

সচেতন। বঙ্গভঙ্গ আন্দোলনে রবীন্দ্রনাথের এই সচেতনতা তৎকালীন কবিতার মাধ্যমে কিভাবে উঠে এসেছে— সেদিকেই এবার আমরা আলোকপাত করব।

রবীন্দ্র স্বদেশপ্রেম ভারতবাসীর কাছে অমূল্য সম্পদ। বাংলা সাহিত্যে তাঁর স্বদেশপ্রেমের প্রথম প্রকাশ ‘হিন্দুমেলার উপহার’ কবিতা দিয়ে। পরবর্তীতে একাধিক কবিতা, গান, প্রবন্ধ, উপন্যাস, চিঠিপত্র, বক্তৃতায় তাঁর স্বদেশপ্রেমের গভীর অনুভূতি প্রকাশ পেয়েছে, যা বাংলা সাহিত্য তথা ভারতবাসীর জন্য মহামূল্যবান। জীবনের ঘাত-প্রতিঘাত তাঁর এই স্বদেশপ্রেমের অনুভূতিকে প্রতিনিয়ত নতুন মাত্রা দিয়েছে। বঙ্গভঙ্গ আন্দোলন তেমনই একটি আন্দোলন, যার প্রভাব তাঁর স্বদেশপ্রেমের পথ পরিবর্তন করেছে।

রবীন্দ্রনাথ পারিবারিক সূত্রে শৈশব থেকেই স্বদেশপ্রেমের আবহাওয়ার মধ্যে বড় হয়ে ওঠেন। ঊনবিংশ শতকে স্বদেশচেতনায় উদ্বুদ্ধ শিক্ষিত বাঙালি পরিবারের মধ্যে ঠাকুরবাড়ি ছিল অন্যতম। সেই পরিবারগত স্বদেশপ্রেমের ভাব রবীন্দ্রনাথের অস্থিমজ্জায় মিশে যায় এবং পরবর্তীকালে কবিতায় গানে ও অন্যান্য রচনায় তার বহিঃপ্রকাশ ঘটে। রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর তাঁর ‘জীবনস্মৃতি’ গ্রন্থে বলেছেন—

> “আমাদের বাড়ির সাহায্যে হিন্দু-মেলা বলিয়া একটি মেলা সৃষ্টি হইয়াছিল। . . . ভারতবর্ষকে স্বদেশ বলিয়া ভক্তির সহিত উপলব্ধির চেষ্টা সেই প্রথম হয়। মেজদাদা সেই সময়ে বিখ্যাত জাতীয় সংগীত ‘মিলে সবে ভারত সন্তান’ রচনা করিয়াছিলেন। এই মেলায় দেশের স্তবগান গীত, দেশানুরাগের কবিতা পঠিত, দেশী শিল্প-ব্যায়াম প্রভৃতি প্রদর্শিত ও দেশী গুণী লোক পুরস্কৃত হইত।”[৩]

এখান থেকেই রবীন্দ্রনাথের স্বদেশচেতনার পাঠ শুরু। তাঁর এই দেশভক্তির প্রথম পরিচয় পাওয়া যায় প্রায় ১৪-১৫ বছর বয়সে হিন্দুমেলার অনুষ্ঠানে। কবি লর্ড লিটনের দিল্লীদরবার নিয়ে তিনি একটি কবিতা রচনা করেন এবং ‘হিন্দুমেলা’র অনুষ্ঠানে গাছের তলায় বসে কবিতাটি পাঠ করেছিলেন। সেই কবিতায় উঠ্‌তি বয়সের আবেগময় স্বদেশপ্রীতির ভাবোচ্ছ্বাস উচ্ছ্বসিত হয়ে প্রকাশ পায়। এতখানি ভাবোচ্ছ্বাস হিন্দুমেলায় অন্য কোনো সদস্যের মধ্যে তখনও পর্যন্ত দেখা যায়নি। পরবর্তীতে স্বদেশপ্রেমের ভাবোচ্ছাসকে ছড়িয়ে দিতে ঠাকুরবাড়ির সদস্যেরা গোপনে সভা তৈরি করেন। রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর ‘জীবনস্মৃতি’তে লিখেছেন—

> “জ্যোতিদাদার উদ্যোগে আমাদের একটি সভা হইয়াছিল . . . ইহা স্বাদেশিকের সভা। . . . আমাদের মত অর্বাচীনও এই সভার সভ্য ছিল . . . এই সভায় আমাদের প্রধান কাজ (বীরত্বের) উত্তেজনার আগুন পোহানো।”[৪]

১৯০৫ সালে বঙ্গভঙ্গ আন্দোলনের সময় এই স্বদেশপ্রেম রবীন্দ্রনাথ ঠাকুরের কবিতায় প্রতিবাদ ও বিদ্রোহ রূপে স্বতঃস্ফূর্তভাবে প্রকাশ পেয়েছে। তবে আমাদের আলোচনার সুবিধার্থে রবীন্দ্রনাথ ঠাকুরের দেশাত্মবোধক কবিতাকে মোটামুটি দুটি ভাগে ভাগ করে নিলে আমাদের বক্তব্য সুস্পষ্টভাবে তুলে ধরা সম্ভব হবে— ক. প্রাক্-বঙ্গভঙ্গ যুগ, খ. বঙ্গভঙ্গ যুগ।

(ক) প্রাক্-বঙ্গভঙ্গ যুগে রবীন্দ্রনাথের সকল দেশাত্মবোধক কবিতার একটাই উদ্দেশ্য, সমাজের যুব-শক্তিকে জাগিয়ে তোলা। রবীন্দ্রনাথ চাইতেন দেশের আপামর জনসাধারণের মধ্যে স্বদেশচেতনা জেগে উঠুক। এটি সহজ কাজ নয়। এর জন্য প্রয়োজন দীর্ঘ মেয়াদী পরিকল্পনা, যা তিনি ‘স্বদেশী সমাজ’ প্রবন্ধের মধ্যে বলে গেছেন। তিনি মনে করতেন জনসাধারণের হৃদয়ে স্বদেশপ্রেম জাগাতে সমাজের যুব-শক্তিকে মাতিয়ে তুলতে হবে।

প্রাক্-বঙ্গভঙ্গ যুগটি ছিল রবীন্দ্রনাথের ‘স্বদেশী সমাজ’ গড়ে তোলার প্রস্তুতিপর্ব। এই সময় তিনি দেশাত্মবোধক কবিতা রচনা করে দেশের ছাত্রসমাজকে দেশপ্রেমে মাতিয়ে তুলতে চেষ্টা করেছেন। এ যুগের দেশাত্মবোধক কবিতার মধ্যে রবীন্দ্রনাথের প্রায় পাঁচ-ছয় রকমের ভাব ফুটে উঠেছে। এই ভাবগুলি হল— দেশমাতৃকার জননী রূপ কল্পনা, জন্মভূমির অতীত গৌরবকথা বর্ণনা, ভারতের অতীত সংস্কৃতির গর্ববোধ, দেশের মঙ্গলময়ী মাতার আহ্বান, দেশমাতার প্রতি সন্তানের আত্মনির্ভরশীল হওয়ার অনুরোধ জনক কবিতা, দেশমাতৃকার চরণে ভক্তি ও অনুরাগের অঞ্জলি প্রদান প্রভৃতি।

বেশ কিছু কবিতায় তিনি প্রাচীন ভারতের মহৎ বৈশিষ্ট্য তুলে ধরে দেশমাতৃকার গৌরবগাঁথা গেয়েছেন। এই ধরনের কবিতার মাধ্যমে তিনি দেশের শিক্ষিত তরুণদের মধ্যে স্বদেশপ্রীতির ভাব জাগাতে চেয়েছেন। এই ধরনের কবিতাগুলির মধ্যে রয়েছে— 'হে বিশ্বদেব, মোর কাছে তুমি', 'আশা', 'মাতার আহ্বান', 'জগদীশচন্দ্র বসু', 'তপোবন', 'প্রাচীন ভারত', 'হে সকল ঈশ্বরের পরম ঈশ্বর', 'একদা এ ভারত কোন্ বনতলে', 'হে ভারত, নৃপতিরে শিখাইয়েছ তুমি', 'হে ভারত, তব শিক্ষা দিয়েছে যে ধন', 'হিমালয়', 'ক্ষান্তি', 'শিলালিপি', 'হরগৌরী', 'তপোমূর্তি', 'সঞ্চিতবাণী' প্রভৃতি। এই কবিতাগুলিতে কবি তুলে ধরেছেন— ভারতের প্রাচীন তপবনের কথা, সেখানকার অমর ঋষিদের তপস্যা, গায়ত্রীমন্ত্র, প্রাচীন ভারতের ক্ষত্রিয় গড়িমা, হরগৌরীর বিচিত্র মূর্তি, প্রকৃতির মহিমা, শিলালিপির সনাতন পুঁথি। 'প্রাচীন ভারত' কবিতায় কবি বলেছেন—

"দিকে দিকে দেখা যায় বিদর্ভ বিরাট
অযোধ্যা পাঞ্চাল কাঞ্চী উদ্ধতললাট
স্পর্ধিছে অম্বরতল অপাঙ্গ-ইঙ্গিতে;
*** *** ***
হেথা মত্ত স্ফীতস্ফূর্ত ক্ষত্রিয়গরিমা,
হোথা স্তব্ধ মহামৌন ব্রাহ্মণ মহিমা।"[৫]

আবার 'হে বিশ্বদেব' কবিতায় কবি বলেছেন—

"শুনিনু তোমার স্তবের মন্ত্র অতীতের তপোবনেতে—
অমর ঋষি হৃদয় ভেদিয়া ধ্বনিতেছে ত্রিভুবনেতে;"[৬]

'হিমালয়' কবিতায় কবি বলেছেন—

"হে গিরি, যৌবন তব যে দুর্দম অগ্নিতাপবেগে
আপনারে উৎসারিয়া মরিতে চাহিয়াছিল মেঘে—
সে তাপ হারায়ে গেছে, সে প্রচন্ড গতি অবসান,
নিরুদ্দেশ চেষ্টা তব হয়ে গেছে প্রাচীন পাষাণ।
পেয়েছ আপন সীমা, তাই আজি মৌনশান্তহিয়া
সীমাবিহীনের মাঝে আপনারে দিয়েছ সঁপিয়া।"[৭]

স্বদেশের এই সকল বৈশিষ্ট্য যেন দেশবাসীর হৃদয়ে স্বদেশ সম্পর্কে ভালোবাসা ও গৌরব বৃদ্ধি করে— এটাই রবীন্দ্রনাথের একমাত্র উদ্দেশ্য।

কিছু কবিতায় কবি দেশমাতার বন্দনা করে তাকে অনুরোধ করেছেন যে, তিনি যেন তার সন্তানদের স্নেহের আশিষ দিয়ে আঁচলের তলায় ঘুম পাড়িয়ে না রাখেন। তাদেরকে যেন আত্মনির্ভরশীল হতে সাহায্য করেন। শুধুমাত্র ফুল ছড়ানো পথে হাঁটা নয়, লক্ষ্মীছাড়া মত কাঁটা বিছানো পথে হেটেও যেন বিজয়ী হতে পারে। কবি লিখেছেন—

"সাত কোটি সন্তানেরে হে, মুগ্ধ জননী
রেখেছো বাঙালি ক'রে, মানুষ করনি।"[৮]

আবার যুবসমাজের ভয় দূর করতে মঙ্গলময়ী মাতার কাছে প্রার্থনা করেছেন—

"এ দুর্ভাগ্য দেশ হতে হে মঙ্গলময়,
দূর করে দাও তুমি সর্ব তুচ্ছ ভয়—
লোকভয়, রাজভয়, মৃত্যুভয় আর।"[৯]

বেশ কিছু কবিতায় কবি ইংরেজি শিক্ষায় শিক্ষিত বাঙালির চেতনায় স্বদেশমাতার সম্মান জাগানোর চেষ্টা করেছেন। এই শ্রেণীর কবিতাগুলির মধ্যে পড়ছে 'পরবেশ', 'দুরন্ত আশা', 'ভিক্ষায়াং নৈব নৈব চ', 'অভিমান', 'সে আমার জননী রে' প্রভৃতি।

এরপর রবীন্দ্রনাথের স্বদেশচেতনার পরিবর্তন ঘটেছে। তাঁর স্বদেশচেতনায় অতীতগৌরবের কথা আর নেই, আছে গ্রাম বাংলার হত-দরিদ্র মানুষের বাস্তবচিত্র। যেমন— 'এবার ফিরাও মোরে' কবিতায় তিনি বলেছেন—

“ওই যে দাঁড়ায়ে নতশির
মূক সবে— ম্লান মুখে লেখা শুধু শত শতাব্দীর
বেদনার করুণ কাহিনী ; স্কন্ধে যত চাপে ভার
বহি চলে মন্দগতি, যতক্ষণ থাকে প্রাণ তার—
তার পরে সন্তানেরে দিয়ে যায় বংশ বংশ ধরি,
নাহি ভর্ৎসে অদৃষ্টেরে, নাহি নিন্দে দেবতারে স্মরি,
মানবেরে নাহি দেয় দোষ, নাহি জানে অভিমান,
শুধু দুটি অন্ন খুঁটি কোনোমতে কষ্টক্লিষ্ট প্রাণ
রেখে দেয় বাঁচাইয়া।”[১০]

এই তীব্র বাস্তবতার চিত্র তাঁর প্রত্যক্ষ অভিজ্ঞতাজাত। তিনি জমিদারী পরিদর্শনকালে স্বদেশের এই বাস্তবরূপ দেখেছিলেন। মানুষের প্রাথমিক চাহিদা অন্ন-বস্ত্র-বাসস্থান, সেই চাহিদা পূরণের ক্ষমতা তাদের নেই। রবীন্দ্রনাথ স্বদেশের এই অশিক্ষাজনিত দারিদ্র্যের জ্বালায় জর্জরিত মানুষের দুঃখ কষ্ট দূর করার আহ্বান জানালেন যুবসমাজের কাছে—

> “ভারতমাতা যে হিমালয়ের দুর্গম চূড়ার উপরে শিলাসনে বসিয়া কেবলই করুণ সুরে বীণা বাজাইতেছেন, এ কথা ধ্যান করা নেশা করা মাত্র— কিন্তু, ভারতমাতা যে আমাদের পল্লীতেই পঙ্কশেষ পানাপুকুরের ধারে ম্যালেরিয়াজীর্ণ প্লীহারোগীকে কোলে লইয়া তাহার পথ্যের জন্য আপন শূন্য ভাণ্ডারের দিকে হতাশ-দৃষ্টিতে চাহিয়া আছেন, ইহা দেখাই যথার্থ দেখা।”[১১]

রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর অনুভব করেছিলেন, ভারতবর্ষে ৭০ শতাংশ মানুষ গ্রামে অবস্থিত। এদের পেটে ভাত নেই, রোগে ঔষধ নেই, আর শিক্ষা তো দূরের কথা। এরা স্বদেশ কী জানে না, স্বরাজকে ভাবে ক্ষুধা নিবারণের কোনো বস্তু। দেশের উন্নতি করতে হলে এই গ্রামের মানুষের শিক্ষা প্রয়োজন। তাঁর মতে এ কাজ সম্পূর্ণ করতে দেশের শিক্ষিত মানুষদেরই এগিয়ে আসতে হবে। তিনি তরুণদেরকে আহ্বান করে বলেছিলেন—

“এই-সব মূঢ় ম্লান মূক মুখে
দিতে হবে ভাষা— এই-সব শ্রান্ত শুষ্ক ভগ্ন বুকে
ধ্বনিয়া তুলিতে হবে আশা— ডাকিয়া বলিতে হবে—
মুহূর্ত তুলিয়া শির একত্র দাঁড়াও দেখি সবে,
যার ভয়ে তুমি ভীত সে অন্যায় ভীরু তোমা চেয়ে,
যখনি জাগিবে তুমি তখনি সে পলাইবে ধেয়ে ;”[১২]

রবীন্দ্রনাথ স্বদেশের ভাবময় রোমান্টিক কল্পনায় বিভোর না থেকে দেশের প্রকৃত অবস্থার দিকে ছাত্রদের মনোযোগ আকর্ষণ করতে চেয়েছিলেন। কবি ‘বঙ্গবাসীর প্রতি’ কবিতায় বলেছেন—

“কে জাগিবে আজ, কে করিবে কাজ,
কে ঘুচাতে চাহে জননীর লাজ—
কাতরে কাঁদিবে, মা’র পায়ে দিবে
সকল প্রাণের কামনা।”[১৩]

এখানে কবি যুব-সমাজকে সচেতন করে গ্রামের উন্নতি সাধনে তরুণদের উদ্দেশ্যে কর্মের ডাক দিয়েছেন। ‘বঙ্গভূমির প্রতি’ কবিতায় কবি বলেছেন—

“তুমি তো দিতেছ, মা, যা আছে তোমারি—
স্বর্ণশস্য তব, জাহ্নবীবারি,
জ্ঞান ধর্ম কত পুণ্যকাহিনী।
এরা কী দেবে তোরে, কিছু না, কিছু না—
মিথ্যা কবে শুধু হীন পরানে!”[১৪]

এখানে কবির সংশয় প্রকাশ পেয়েছে। তাঁর মনে হয়েছে— সত্যি কি নগরবাসী গ্রাম-উন্নয়নের কাজে এগিয়ে আসবে? না কি তারা শুধুই নিজেদের মিথ্যা স্বদেশ গৌরবের কথা বলবে। মিথ্যা স্বদেশগৌরব বলতে শিক্ষিতদের ভাবময় স্বদেশ কল্পনাকে বুঝিয়েছেন। কবির মতে স্বদেশ কোনো কাল্পনিক দেশ নয়, স্বদেশ বলতে ভূমিখণ্ডের সঙ্গে দেশের মানুষকে বোঝায়। 'হীন পরান' বলতে নগরবাসীদের স্বার্থপরতার কথা বলেছেন। তারা শুধু নিজেদের কথাই ভাবছে, গ্রামবাসীদের জন্য তাদের কোনো ভাবনা নেই। তারা বুঝতেও পারছে না যে, দেশের উন্নতি করতে হলে গ্রামের উন্নতি আগে প্রয়োজন।

কবি গ্রাম-উন্নতির কাজে শিক্ষিত মানুষের সাড়া না পেয়ে 'দেশের উন্নতি' কবিতায় ধিক্কার জানিয়েছেন—

"বাঙালি বড়ো চতুর, তাই
আপনি বড়ো হইয়া যাই,
অথচ কোনো কষ্ট নাই
চেষ্টা নাই তার।"[১৫]

এখানে কবি দেশবাসীর অলসতা, ভীরুতা, কর্মহীন মানসিকতা, মিথ্যা আত্মগৌরবকে ব্যঙ্গের সুরে ধিক্কার জানিয়েছেন। আসলে কবি বঙ্গমাতাকে উদ্দেশ্য করে বঙ্গবাসীকেই কথাগুলি শুনিয়েছেন।

প্রাক্-বঙ্গভঙ্গের কবিতা রচনার দ্বারা রবীন্দ্রনাথ বাঙালি জাতিকে স্থবিরতা, সংকীর্ণতা, গতানুগতিকতা ও ক্ষুদ্রতার গণ্ডি ভেঙ্গে আলোর পথে উত্তরণের চেষ্টা করেছেন।

(খ) প্রাক্-বঙ্গভঙ্গ যুগে রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর তাঁর কবিতার দ্বারা বাংলার শিক্ষিত তরুণদের স্বদেশভাবনায় দেশের অস্তিত্ব, দেশের অবস্থা— তার অতীত গরিমা ও বর্তমান দৈন্য সম্পর্কে সচেতন করে তোলেন। কিন্তু বঙ্গভঙ্গের যুগে দেশের পরিস্থিতি পাল্টেছে। এই যুগে স্বদেশপ্রেম তৎকালীন বর্তমান ভাবনার দিকে মোড় নিয়েছে। বর্তমান চিন্তা দেশের বর্তমান দুর্দশায় দুঃখবোধ, দুর্দশার কারণ অনুসন্ধান, তাঁর প্রতিকারের পথ খোঁজার মধ্যে প্রকাশ পায়। জাতির দুর্বলতা, পরাধীনতার গ্লানি, বেদেশি শাসকের শোষণ— ইত্যাদি দেশের দুরবস্থার কারণ এবং আত্মনির্ভরতা, জাতীয় উন্নতি, জাতীয় তদেবক্য— প্রভৃতি এই দুর্দশামোচনের উপায়। দেশপ্রীতি এখন কর্মসাধনার অঙ্গ। এই কর্মের দুটি দিক— বিদেশি বর্জন ও স্বদেশি জিনিসের প্রতি অনুরাগ। এই যুগে রবীন্দ্রনাথের ভূমিকা ছিল অনন্য সাধারণ। তিনি যুব-সমাজের সভা-সমিতিতে যোগ দেন এবং তাদের আরও উৎসাহিত করতে একাধিক স্বদেশি গান রচনা করেন এবং তা নিজ কণ্ঠে গেয়ে শোনান।

বঙ্গভঙ্গ আন্দোলন চলাকালীন রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর দুটি কাব্যগ্রন্থ রচনা করেন— ১. খেয়া এবং ২. গীতাঞ্জলি। এই সময় রবীন্দ্রনাথের মধ্যে দুটি সত্ত্বা কাজ করেছে— আন্দোলনের কর্ম-ব্যস্ততা এবং অন্তরের আধ্যাত্মিক সাধনার তাড়না। এই দোটানার প্রকাশ রয়েছে 'খেয়া' কাব্যগ্রন্থের মধ্যে।

রবীন্দ্র-বিশেষজ্ঞ উপেন্দ্রনাথ ভট্টাচার্য রবীন্দ্রনাথের 'খেয়া' কাব্যগ্রন্থের ব্যাখ্যা প্রসঙ্গে কবি-হৃদয়ের দ্বন্দ্বের কথা উত্থাপন করেছেন। এই দ্বন্দ্বের ওপর ভিত্তি করে তিনি 'খেয়া' কাব্যগ্রন্থকে 'সাংকেতিক ধর্মী কাব্যগ্রন্থ' বলেছেন। তাঁর মতে 'খেয়া' কাব্যগ্রন্থের তিনটি সংকেত— ঘাট, পথ ও ঘর। 'ঘাট' হল পরপারের সংকেত, অর্থাৎ মৃত্যু পরবর্তী জীবন। 'পথ' হল কর্মব্যস্ততার সংকেত, এই কর্মব্যস্ততা মহৎ কাজের জন্য, যেমন— স্বদেশি আন্দোলনে দেশের জন্য কাজ করা। উপেন্দ্রনাথ ভট্টাচার্য 'পথ'-এর সংকেত বলতে কবি-হৃদয়ের আন্দোলন কেন্দ্রিক কর্মব্যস্ত জীবনকে বুঝিয়েছেন। আর 'ঘর'-এর সংকেত বলতে মানবিক রসভোগ ও আত্মদর্শনের ভাবপ্রকাশকে বুঝিয়েছেন।

রবীন্দ্র-জীবনের স্বদেশি আন্দোলনের কর্মের উত্তেজনা এবং তা থেকে নিস্মৃত স্মৃতি মলিন আলো তাঁর আধ্যাত্ম-সাধনার পথকে নতুন মাধুর্যে ভরিয়ে তুলেছে। সৃষ্টি হয়েছে মনহরণকারী কবিতা। 'ঘাটের পথ' কবিতায় কবি প্রকাশ করেছেন কর্মব্যস্তায় থাকার জন্য আধ্যাত্ম-সাধনায় বিঘ্ন ঘটার কথা। কবি লিখেছেন—

"আমি কোন্ ছলে যাব ঘাটে—
শাখা-থরোথরো পাতা-মরোমরো
ছায়া-সুশীতল বাটে?
বেলা বেশি নাই, দিন হল শোধ—

ছায়া বেড়ে যায়, পড়ে আসে রোদ—
এ বেলা কেমনে কাটে?
আমি কোন্ ছলে যাবো ঘাটে?"[১৬]

একদিকে স্বদেশি আন্দোলনের কর্মব্যস্ত জীবন, আর অন্যদিকে আধ্যাত্মিক জীবনের ভগবান সাধনায় প্রাণ ব্যাকুল হয়ে উঠেছে— এই দ্বন্দ্ব সর্বক্ষণ রবিন্দ্র-চেতনায় বিরাজ করছে। রবীন্দ্রনাথ লিখছেন—

"যবে বুকে ভরি ওঠে ব্যথা,
ঘরের ভিতরে না দেয় থকিতে
অকারণ আকুলতা।
*** *** ***
ওগো দিনে কতবার ক'রে
ঘর-বাহিরের মাঝখানে রহি
ওই পথ ডাকে মোরে।"[১৭]

আবার, 'ঘাটে' কবিতায় কবি আধ্যাত্ম জীবনকে দূরে রেখে স্বদেশি আন্দোলনের কর্মব্যস্তাকেই স্বাগত জানিয়েছেন—

আমার আশার তরী ডুবল যদি
দেখব তোদের তরী বাওয়া।
*** *** ***
আমার সেইখানেতেই কল্পলতা
যেখানে মোর দাবি-দাওয়া।"[১৮]

বঙ্গভঙ্গ আন্দোলনের সময় কবি-হৃদয়ের এই ঘাটের সাথে পথের দ্বন্দ্ব 'খেয়া' কাব্যগ্রন্থের কবিতায় বারে বারে উঠে এসেছে।

'অনাবশ্যক' কবিতায় কবি লিখেছেন—

"অমাবস্যা আঁধার দুই পহরে
জিজ্ঞাসিলাম তাহার কাছে গিয়ে,
'ওগো, তুমি চলেছ কার তরে
প্রদীপখানি বুকের কাছে নিয়ে?
আমার ঘরে হয় নি আলো জ্বালা,
দেউটি তব হেথায় রাখো বালা।'
অন্ধকারে দুটি নয়ন কালো
ক্ষণেক মোরে দেখল চেয়ে তবে—
সে কহিল, 'এনেছি এই আলো,
দীপালিতে সাজিয়ে দিতে হবে।'
চেয়ে দেখি, লক্ষ দীপের সনে
দীপখানি তার জ্বলে অকারণে।"[১৯]

এই কবিতায় কবি অমাবস্যার দীপাবলিতে সম্পূর্ণ অপ্রয়োজনে প্রদীপ জ্বালানোর প্রসঙ্গ এনে একটি নতুন বার্তা দিলেন। আসলে কবি প্রয়োজনের তুলনায় অপ্রয়োজনের কর্মশক্তিকে বেশি প্রাধান্য দিয়েছেন। সংসারের নিত্যকর্মের মাঝে না থেকে দেশের মহৎ কাজে সকলকে সমষ্টিগতভাবে তদেবক্যবদ্ধ হওয়ার আহ্বান করেছেন।

বঙ্গভঙ্গ আন্দোলনকে সমষ্টির শক্তিতে সম্পূর্ণ করতে রবীন্দ্রনাথ অনাহতদেরকেও আহ্বান করেছেন। যেসব লোকেরা জগতের বাস্তবতার সঙ্গে মুখোমুখি হতে ভয় পায়, জগৎ সংসারকে আড়াল-আবডাল থেকে দেখতে চায়, তারা কিছুতেই নিজের অহংগণ্ডি লঙ্ঘন করতে পারে না। তবে রুদ্র যদি অশান্তির বেশে প্রলয় সৃষ্টি করেন, তখন তো তাদের সকল আলস্য, সকল লজ্জা ভূলে গৃহত্যাগ করতে হয়, গৃহের কোণে থাকা চলে না, জগৎ সমক্ষে আসতে

হয়। অর্থাৎ বাস্তবের কঠিন সত্যকে দেখে যারা আহত নয়, তাদেরকেও রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর তাঁর ভাষার তীর ছুঁড়ে বঙ্গভঙ্গ আন্দোলনে সামিল হবার অনুপ্রেরণা জুগিয়েছেন। আসলে কবি ‘অনাহত’ কবিতায় সংসারের নারী শক্তিকে আন্দোলনে যোগ দেওয়ার আহ্বান করেছেন। কবি লিখেছেন—

“জগৎ যদি এক নিমেষে
শক্তিমূর্তি ধ’রে
দাঁড়ায় মুখোমুখি—
কোথায় থাকে আধেক-ঢাকা
অলস দিনের ছায়া,
বাতায়নের ছবি!
কোথায় থাকে স্বপন-মাখা
আপন-গড়া মায়া!
উড়িয়া যায় সবই।”[২০]

‘শুভক্ষণ’, ‘ত্যাগ’ ও ‘প্রভাতে’, ‘অনাহত’, ‘আগমন’ — এই কবিতায় কবির আন্দোলনে যোগ দেওয়ার মনোভাব প্রকাশ পেয়েছে এবং বাকি কবিতা— ‘দান’, অবারিত’, ‘অনাবশ্যক’, ‘নিরুদ্যম’, ‘ফুল ফোটানো’, ‘পথের শেষ’, ‘বিদায়’ প্রভৃতি কবিতায় কবি প্রত্যক্ষভাবে আন্দোলন থেকে নিজেকে সরিয়ে নেওয়ার চেষ্টা করেছেন।

‘শুভক্ষণ’ ও ‘ত্যাগ’ কবিতা দুটি একে অপরের পরিপূরক। দুটি কবিতাই **১৩**ই শ্রাবণ **১৩১২** বঙ্গাব্দে লেখা এবং ওই বছরই অগ্রহায়ণ মাসে ‘বঙ্গদর্শন’ পত্রিকায় প্রকাশিত হয়। শুভক্ষণ কবিতায় কবি বলেছেন— রাজার দুলাল ঘরের সামনে দিয়ে যাবে— এই শুভ মুহূর্তে শুধুমাত্র ঘরের কাজ নিয়ে পড়ে থাকা যায় না। বরং রাজার দুলালকে স্বাগত জানাতে উপযুক্ত সাজে বরণডালা নিয়ে নিজেকে প্রস্তুত রাখতে হবে। কবির এই রাজার দুলালটি হল বঙ্গভঙ্গ আন্দোলন। এই আন্দোলনের মহামিছিল নিজের গৃহবাস দিয়ে যাবার সময় মানুষ শুধুমাত্র গৃহ কাজ নিয়ে পড়ে থাকতে পারেনা। নারী-পুরুষ সকলেই আন্দোলনকে স্বাগত জানাতে অন্তর থেকে প্রস্তুত থাকে। আমাদের মন সেই শুভক্ষণের প্রতীক্ষায় থাকে। কবি লিখেছেন—

“ওগো মা,
রাজার দুলাল যাবে আজি মোর
ঘরের সমুখ-পথে,
আজি এ প্রভাতে গৃহকাজ লয়ে
রহিব বলো কী মতে!
বলে দে আমায় কী করিব সাজ,
কী ছাঁদে কবরী বেঁধে লব আজ,
পরিব অঙ্গে কেমন ভঙ্গে
কোন্ বরনের বাস।
*** *** ***
শুধু সে নিমেষ-লাগি না করিয়া বেশ
রহিব বলো কী মতে!”[২১]

সেই শুভক্ষণ যখন উপস্থিত হল তখন ত্যাগের পালা। কবি ‘ত্যাগ’ কবিতায় উল্লেখ করেছেন রাজার দুলাল ঘরের সামনে দিয়ে যাবার শুভ-মুহূর্তে একটি গৃহবধূ তার সাধের মণিহার ছিঁড়ে পথের ধুলায় বিলিয়ে দিয়েছে। এই মণিহার দানের মধ্যে দিয়ে স্ত্রীদের মঙ্গলসূত্র দানের কথা মনে পড়ে যায়। যুগে যুগে কত স্ত্রী তার স্বামী সন্তানকে রণসজ্জায় সাজিয়ে আন্দোলনে পাঠিয়েছে। তাদের কথা ইতিহাসের পাতায় লেখা নেই। রবীন্দ্রনাথ এই চির-পুরাতন সত্য কথাকে তার ‘ত্যাগ’ কবিতায় তুলে ধরেছেন। কবি লিখেছেন—

“ওগো মা,

রাজার দুলাল গেল চলি মোর
ঘরের সমুখ-পথে,
প্রভাতের আলো ঝলিল তাহার
স্বর্ণশিখর রথে,
ঘামটা খসায়ে বাতায়নে থেকে
নিমেষের লাগি নিয়েছি, মা, দেখে—
ছিঁড়ি মণিহার ফেলেছি তাহার
পথের ধুলার ’পরে
*** *** ***
মোর হার-ছেঁড়া মণি নেয় নি কুড়ায়ে,
রথের চাকায় গেছে সে গুঁড়ায়ে,
চাকার চিহ্ন ঘরের সমুখে
পড়ে আছে শুধু আঁকা।
আমি কী দিলেম কারে জানে না সে কেউ,
ধুলায় রহিল ঢাকা।”[২২]

সমষ্টি ব্যতীত শক্তির গৌরব কোথায়।
‘আগমন’ কবিতায় কবি বলেছেন—

“কোথায় আলো, কোথায় মাল্য,
কোথায় আয়োজন!
রাজা আমার দেশে এল,
কোথায় সিংহাসন!
হায় রে ভাগ্য, হায় রে লজ্জা—
কোথায় সভা, কোথায় সজ্জা!
দু-এক জনে কহে কানে,
‘বৃথা এ ক্রন্দন—
রিক্তকরে শূন্য ঘরে
করো অভ্যর্থন।”[২৩]

আসলে রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর এই কবিতায় মহারাজ বলতে বঙ্গভঙ্গ আন্দোলনকে বুঝিয়েছেন। এই আন্দোলন যে এত শীঘ্র মানুষকে একত্রিত করতে পারবে তা দলনেতারা আশা করেননি। তাই কর্মের ডাকে সারা পেয়ে মানুষ একত্রিত হয়েছে ঠিকই, কিন্তু কী করতে হবে তা জানত না। অর্থাৎ তাদের আন্দোলনে কর্মের লক্ষ্য ঠিক ছিল না। তারা শূন্য ঘরেই, বিনা সাজে আন্দোলনকে স্বাগত জানিয়েছে। লক্ষ্যহীন কর্ম যে সফল হয় না তা কবি পরোক্ষভাবে বোঝাতে চেয়েছেন।

রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর বঙ্গভঙ্গ আন্দোলনের সূচনালগ্নে আন্দোলনের উত্তেজনায় সামিল হলেও বেশ কিছু দিনের মধ্যে তিনি বুঝতে পারেন, এই উত্তেজনা তাঁর জন্য নয়। তিনি আন্দোলন থেকে সরে আসেন। এই আন্দোলনের বয়কটের নামে অন্যায় অত্যাচারকে তিনি গ্রহণ করতে পারেননি।
তিনি ‘বিদায়’ কবিতায় লিখেছেন—

“বিদায় দেহো, ক্ষম অমার ভাই—
কাজের পথে আমি তো আর নাই।
*** *** ****
তোমরা মোরে ডাক দিয়ো না ভাই।
অনেক দূরে এলেম সাথে সাথে,

চলেছিলেম সবাই হাতে হাতে—
এইখানেতে দুটি পথের মোড়ে
হিয়া আমার উঠল কেমন করে
*** *** ***
রত্ন-খোঁজা, রাজ্য-ভাঙ্গা-গড়া,
মতের লাগি দেশ-বিদেশে লড়া,
আলবালে জলসেচন করা
উচ্চশাখা স্বর্ণচাঁপার গাছে।
পারি নে আর চলতে সবার পাছে।”[২৪]

কবিচিত্ত আধ্যাত্ম-জীবনকে গ্রহণ করার জন্য পরিপূর্ণভাবে প্রস্তুত হচ্ছে। বাইরের কর্মকোলাহল, বিচিত্র উন্মাদনা ও উত্তেজনা তাঁর কাছে বোঝা বলে মনে হচ্ছে, নিজেকে নিজে আপন গড়া কর্মশালায় বন্দী বলে মনে করেছেন—

“ভেবেছিলাম আমার প্রতাপ
করবে জগৎ গ্রাস,
আমি রব একলা স্বাধীন
সবাই হবে দাস।
তাই গড়েছি রজনী দিন
লোহার শিকলখানা—
কত আগুন কত আঘাত
নাইকো তার ঠিকানা।
দেখি আমায় বন্দী করে
আমারই এই ডোর।”[২৫]

রবীন্দ্রনাথ বঙ্গভঙ্গ আন্দোলনের সঙ্গে একসাথে অনেক দূর পথ হেঁটেছেন। কিন্তু দেশের মানুষ যখন তাঁর মতাদর্শ থেকে সরে যেতে থাকে তখন তাঁর পথ বদলায়। এই কবিতায় কবি সেই পথ বদলের কথাই প্রকাশ করেছেন।

১৯১১ সালে সরকার বঙ্গভঙ্গের সিদ্ধান্ত রদ করে। বঙ্গভঙ্গ আন্দোলনের এই বিরাট সাফল্যের পেছনে ছিল দেশাত্মবোধের চরম ও প্রবল উৎসাহ এবং কর্মশক্তির প্রবল প্রয়োগ, সুসংযত ও সুপরিকল্পিত নেতৃত্ব। কিন্তু মানবপ্রেমিক রবীন্দ্রনাথ সংকীর্ণ প্রাদেশিকতা, রাজনৈতিক দলাদলি ও উত্তেজনা ইত্যাদি লক্ষ্য করে ক্ষুন্ন মনে সরে এলেন। নেপথ্যে এসেও অনিবার্যভাবে যুক্ত থাকলেন দেশ ও জাতির স্বদেশ সাধনা ও ভাবনার সঙ্গে। তবে এই সময় কবিচিত্ত আধ্যাত্ম জীবনকে গ্রহণ করার জন্য পরিপূর্ণভাবে প্রস্তুত হয়েছে। বাইরের কর্মকোলাহল, বিচিত্র উন্মাদনা ও উত্তেজনা তাঁর কাছে বোঝা বলে মনে হয়েছে। তাই পরবর্তী ‘গীতাঞ্জলি’ কাব্যগ্রন্থের দেশাত্মবোধক কবিতায় ঈশ্বরপ্রেম, মানবপ্রেম ও স্বদেশপ্রেম এক সাথে মিশে গেছে।

রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর যখন ‘গীতাঞ্জলি’ কাব্যগ্রন্থ লিখেছিলেন তখন তিনি বঙ্গভঙ্গ আন্দোলন থেকে সরে এসেছেন। তাই এই কাব্যগ্রন্থে বঙ্গভঙ্গ আন্দোলন-কেন্দ্রিক কোনো কবিতা নেই। কিন্তু এখানে আমরা এই কাব্যগ্রন্থের কয়েকটি কবিতা আলোচনায় এনেছি, যেহেতু তিনি প্রত্যক্ষভাবে যুক্ত না হলেও মানসিকভাবে আন্দোলনে যুক্ত ছিলেন।

‘গীতাঞ্জলি’ কাব্যগ্রন্থটি ১৯১০ খ্রিস্টাব্দে প্রকাশিত হয়। এই কাব্যে মোট ১৫৭টি কবিতা আছে। এগুলি প্রায় সবই কবির ঈশ্বরপ্রেমমূলক আধ্যাত্মিক চেতনার কবিতা। কিন্তু এই কাব্যের বেশ কয়েকটি কবিতায় কবির দেশাত্মবোধের পরিচয় পাওয়া যায়। যেমন— ১০৬, ১০৭, ১০৮, ১০৯ সংখ্যক কবিতা। এই দেশাত্মবোধক কবিতাগুলিতে কবির স্বদেশ-চেতনা, আধ্যাত্ম-চেতনা এবং বিশ্বমানব-চেতনা মিলেমিশে আছে। আসলে এই সময় কবি জাতি ধর্ম নির্বিশেষে মানবধর্মের জয়গান গেয়েছেন—

“হে মোর চিত্ত, পুণ্য তীর্থে

জাগো রে ধীরে—
এই ভারতের মহামানবের
সাগরতীরে।”[২৬]

রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর বঙ্গভঙ্গ আন্দোলনে প্রবেশ করে স্বদেশবাসীর মধ্যে যে হিংসা, হানাহানি, দলাদলি দেখেছিলেন তাতে তিনি ভারতবাসীর মনের মধ্যেই ভেদনীতি প্রত্যক্ষ করেছিলেন। তিনি অনুভব করেছিলেন, দেশবাসীর হৃদয়ের ভেদনীতি যদি না মোছে তবে কার্জনের ভেদনীতি তুলে নিলেও দেশের মঙ্গল সম্ভব নয়। বরং দেশবাসীর হৃদয়ে জ্ঞান, প্রেম, ভক্তি জাগরণের মাধ্যমেই দেশের প্রকৃত মঙ্গল হওয়া সম্ভব।

‘গীতাঞ্জলি’ কাব্যের ‘অপমান’ কবিতায় কবির এই বক্তব্যই প্রকাশ পেয়েছে। এ কথা প্রভাতকুমার মুখোপাধ্যায় তাঁর ‘রবীন্দ্রজীবনী’ গ্রন্থে এবং নেপাল মজুমদার তাঁর ‘ভারতে জাতীয়তা ও আন্তর্জাতিকতা এবং রবীন্দ্রনাথ’ গ্রন্থে স্বীকার করেছেন। কবির কবিতা—

“হে মোর দুর্ভাগা দেশ, যাদের করেছ অপমান
অপমানে হতে হবে তাহাদের সবার সমান।
মানুষের অধিকারে
বঞ্চিত করেছ যারে,
সম্মুখে দাঁড়ায়ে রেখে তবু কোলে দাও নাই স্থান,
অপমানে হতে হবে তাহাদের সবার সমান।
** ** ** **
যারে তুমি নীচে ফেল’ সে তোমারে বাঁধিবে যে নীচে,
পশ্চাতে রেখেছ যারে সে তোমারে পশ্চাতে টানিছে।”[২৭]

‘ভারততীর্থ’ কবিতায় কবি স্বদেশের মধ্যেই তাঁর বিশ্বদেবের প্রতিমূর্তি পরিলক্ষিত করেছেন। ভারতবর্ষকে তিনি বিশ্বমানবের মিলনক্ষেত্র রূপে দেখেছেন। সেই সঙ্গে দেখেছেন ভারতভূমিতেই আছে আন্তর্জাতিক সংস্কৃতির আদান-প্রদান ও মিলনের মহোৎসব। কবি লিখেছেন—

“এসো হে আর্য, এসো অনার্য,
হিন্দু মুসলমান।
এসো এসো আজ তুমি ইংরাজ,
এসো এসো খৃস্টান।
এসো ব্রাহ্মণ, শুচি করি মন
ধরো হাত সবাকার।
এসো হে পতিত, করো অপনীত
সব অপমানভার।”[২৮]

কবি দেখেছেন স্বদেশের মানুষ জাতিভেদ প্রথার দ্বারা, শাস্ত্রের অপব্যাখ্যার দ্বারা মানুষকে অস্পৃশ্য করে রেখেছে। তাতে কবি যথেষ্ট ব্যথিত হয়েছেন। মানুষের গড়া সমাজে যারা নির্যাতিত, হীন, যারা দরিদ্র, নিঃস্ব, সর্বহারা তাদের মধ্যেই তিনি স্বদেশের আত্মা খুঁজে পেয়েছেন এবং তাদের মধ্যেই তিনি ঈশ্বরকে খুঁজে পেয়েছেন।

কবি উপলব্ধি করেছিলেন যে, মানুষকে ঘৃণা করার প্রতিফল স্বরূপ আমাদের চরম শাস্তি গ্রহণ করতে হবে। তাই কবি স্বদেশবাসীকে উদ্ধারের জন্য মানবপ্রেমের দীক্ষায় দীক্ষিত হতে ডাক দিয়েছেন। তিনি মিলতে চেয়েছেন সেই অপমানিতদের সাথে—

“যেথায় থাকে সবার অধম দীনের হতে দীন
সেইখানে যে চরণ তোমার রাজে
সবার পিছে, সবার নীচে,
সব-হারাদের মাঝে।”[২৯]

আবার, আর একটি কবিতায় লিখেছেন—

"এসো, বন্ধু, তোমরা সবে
একসাথে সব বাহির হবে,
আজকে যাত্রা করব মোরা
অমানিতের ঘরে।"[৩০]

কবি এখানে 'অপমানিতদের' অর্থাৎ সমাজ যাদের অস্পৃশ্য বলে দূরে ঠেলে রেখেছে তাদের সঙ্গে মিলে গিয়ে পাপের বোঝা কমাতে চেয়েছেন।

বঙ্গভঙ্গ আন্দোলনের সময় রবীন্দ্র স্বদেশপ্রেম ভারতবাসী গ্রহণ করতে পারেনি। স্বদেশপ্রেমের অভাব ১৯১১ সালে বঙ্গের অঙ্গচ্ছেদ রোধ করলেও ১৯৪৭ সালে সেই বিভাজনকে প্রতিষ্ঠা করেছে। আজও ভারতবাসী সেই বিষবৃক্ষের ফল ভোগ করছে।

তথ্যসূত্র:

১. ঠাকুর, রবীন্দ্রনাথ। 'উৎসর্গ'। রবীন্দ্র রচনাবলী (পঞ্চম খণ্ড, সুলভ সংস্করণ)। বিশ্বভারতী, কলকাতা, পৃ: ৮৮।
২. ঠাকুর, রবীন্দ্রনাথ। শোকচিহ্। ভাণ্ডার পত্রিকা, পৃ: ৮৫।
৩. ঠাকুর, রবীন্দ্রনাথ। স্বাদেশিকতা। জীবনস্মৃতি। রবীন্দ্র রচনাবলী (নবম খণ্ড, সুলভ সংস্করণ)। বিশ্বভারতী, কলকাতা, পৃ: ৪৬৩।
৪. তদেব, পৃ: ৪৬৩।
৫. ঠাকুর, রবীন্দ্রনাথ। প্রাচীন ভারত । সংকল্প ও স্বদেশ, বিশ্বভারতী গ্রন্থনবিভাগ, কলকাতা, পৃ: ৭৬।
৬. ঠাকুর, রবীন্দ্রনাথ। সংকল্প ও স্বদেশ। বিশ্বভারতী গ্রন্থনবিভাগ, কলকাতা, পৃ: ৪৯।
৭. তদেব, পৃ: ১০০।
৮. ঠাকুর, রবীন্দ্রনাথ। বঙ্গমাতা । সংকল্প ও স্বদেশ, বিশ্বভারতী গ্রন্থনবিভাগ, কলকাতা, পৃ: ৬১।
৯. ঠাকুর, রবীন্দ্রনাথ। সংকল্প ও স্বদেশ। বিশ্বভারতী গ্রন্থনবিভাগ, কলকাতা, পৃ: ৭৭।
১০. ঠাকুর, রবীন্দ্রনাথ। এবার ফিরাও মোরে। চিত্রা। রবীন্দ্র রচনাবলী (দ্বিতীয় খণ্ড, সুলভ সংস্করণ)। বিশ্বভারতী, কলকাতা, পৃ: ১৪২।
১১. ঠাকুর, রবীন্দ্রনাথ। 'ছাত্রদের প্রতি সম্ভাষণ', 'আত্মশক্তি', রবীন্দ্র রচনাবলী (দ্বিতীয় খণ্ড, সুলভ সংস্করণ), বিশ্বভারতী, কলকাতা, পৃ: ৬৬৫।
১২. ঠাকুর, রবীন্দ্রনাথ। এবার ফিরাও মোরে। চিত্রা। রবীন্দ্র রচনাবলী (দ্বিতীয় খণ্ড, সুলভ সংস্করণ)। বিশ্বভারতী, কলকাতা, পৃ: ১৪২।
১৩. ঠাকুর, রবীন্দ্রনাথ। বঙ্গবাসীর প্রতি। কড়ি ও কোমল। রবীন্দ্র রচনাবলী (প্রথম খণ্ড, সুলভ সংস্করণ)। বিশ্বভারতী, কলকাতা, পৃ: ২১৮।
১৪. ঠাকুর, রবীন্দ্রনাথ। বঙ্গভূমির প্রতি। কড়ি ও কোমল। রবীন্দ্র রচনাবলী (প্রথম খণ্ড, সুলভ সংস্করণ)। বিশ্বভারতী, কলকাতা, পৃ: ২১৭।
১৫. ঠাকুর, রবীন্দ্রনাথ। দেশের উন্নতি। মানসী। রবীন্দ্র রচনাবলী (প্রথম খণ্ড, সুলভ সংস্করণ)। বিশ্বভারতী, কলকাতা, পৃ: ২৯৭।
১৬. ঠাকুর, রবীন্দ্রনাথ। ঘাটের পথ। খেয়া। বিশ্বভারতী, কলকাতা, পৃ: ১৫।
১৭. তদেব, পৃ: ১৭।
১৮. ঠাকুর, রবীন্দ্রনাথ। ঘাটে। খেয়া। বিশ্বভারতী, কলকাতা, পৃ: ১৯।
১৯. ঠাকুর, রবীন্দ্রনাথ। অনাবশ্যক। খেয়া। বিশ্বভারতী, কলকাতা, পৃ: ৫০।
২০. ঠাকুর, রবীন্দ্রনাথ। অনাহত। খেয়া। বিশ্বভারতী, কলকাতা, পৃ: ৪৪।
২১. ঠাকুর, রবীন্দ্রনাথ। শুভক্ষণ। খেয়া। বিশ্বভারতী, কলকাতা, পৃ: ২০-২১।

২২. ঠাকুর, রবীন্দ্রনাথ। ত্যাগ। খেয়া। বিশ্বভারতী, কলকাতা, পৃ: ২১-২২।
২৩. ঠাকুর, রবীন্দ্রনাথ। আগমন। খেয়া। বিশ্বভারতী, কলকাতা, পৃ: ২৫ ।
২৪. ঠাকুর, রবীন্দ্রনাথ। বিদায়। খেয়া । বিশ্বভারতী, কলকাতা, পৃ: ৯৬-৯৭।
২৫. ঠাকুর, রবীন্দ্রনাথ। 'বন্দী', খেয়া। বিশ্বভারতী, কলকাতা, পৃ: ৭৯।
২৬. ঠাকুর, রবীন্দ্রনাথ। গীতাঞ্জলি। বিশ্বভারতী, কলকাতা, পৃ: ১৩১।
২৭. ঠাকুর, রবীন্দ্রনাথ। গীতাঞ্জলি। বিশ্বভারতী, কলকাতা, পৃ: ১৩৬।
২৮. তদেব, পৃ: ১৩৪।
২৯. তদেব, পৃ: ১৩৫।
৩০. তদেব, পৃ: ১৫৪।